গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগল, পাগলাগারদ ও সমাজ

(১৮০০-১৯৪৭)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের ইতিহাস বিভাগে
পি এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য পেশকৃত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

মহঃ ইনসান আলি

গবেষণার তত্ত্বধায়ক
ড. সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কোলকাতা-৭০০০৩২

রেজিস্ট্রেশন নং – A00HI1402617

2022

গবেষণার অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

কান্ডজ্ঞানহীন, বিকৃতমস্তিষ্ক, উন্মাদ সহজ বাংলা ভাষায় পাগল। যুগ যুগ ধরে ওরা কেমনভাবে আলোচিত বা সমালোচিত। সমাজবিদ্যাচর্চার দুর্ভাগ্য ওরাও লেখেনি ওদের ইতিহাস ! কারন ওরা তো পাগল! ওদের কথাবার্তা বা নীরবতা সভ্যসমাজের দৃষ্টিতে অসমীচীন, নিরর্থক বা হাস্যকর কিংবা তাদের বাহ্যিক আচরণ স্বভাবসিদ্ধ নয়। সভ্যসমাজের দৃষ্টিতে বিকৃত মস্তিষ্কের বহিঃপ্রকাশ। সমাজ ও সভ্যতা মনে করে যাদের মনের মধ্যে অন্যরকম এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে অথবা প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সমাজের কাছে যুক্তিহীন , বা ননসেন্সদের মতো। তাদের এসব আচরণ, আত্মভাব ও অঙ্গস্বভাব সম্পর্কে সভ্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কী হতে পারে , তা আমরা সবাই জানি। কারও দৃষ্টিতে এরা মানসিক রোগী, কারও দৃষ্টিতে এরা উন্মাদ। হয়তো ওরা অপেক্ষাকৃত বেশ ক্ষিপ্ত কিংবা বিনয়ী তাই তাদের অযৌক্তিক কথোপকথন শুনতে ও নীরব আচরণ বুঝতে রাজী নয় সভ্য মানুষ। তাই এদের স্থান পাগলাগারদে কিংবা কোনো এক মানসিক হাসপাতালে। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এরা এভাবেই মানুষেরকাছে অবহেলিত হয়ে আসছে বারং বার। যাইহোক, হয়তো ওরা অস্বাভাবিক, উন্মাদ, কান্ডজ্ঞানহীন কিংবা ননসেন্স যা-ই বলা হোক না কেন, আপাতত 'পাগল' শব্দটির উপর ভিত্তি করেই সমাজবিদ্যাচর্চায় ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগলদের ইতিহাস আলোকপাত করা অবশ্যই দরকার।

গ্রন্থ পর্যালোচনা

গবেষণার প্রাথমিক পর্বে যে সমস্ত গ্রন্থগুলি অধ্যায়ন করার চেষ্টা করেছি সেগুলি হল বিনোদ বিহারী সংকলিত *'পাগল'* নামক গ্রন্থ, অতুল কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'পাগলের হাট' শিবশঙ্কর শ্রেণীর *'পাগলের কথা'* , শ্রী দীননাথ ভট্টাচার্যের *' পাগলের মনের কথা'*, আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিচিত্র প্রবন্ধ 'পাগল' , সোমদত্তের 'পাগলিনী কথা' গৌতম হালদারের 'না মানার পাগলামি' শান্তি ধর সম্পাদিত গ্রন্থ *'পাগলী'*, শ্রী নগেশ চন্দ্রের *'উন্মাদ মন '* চৈতন্য কুমারের *'পাগল ও পাগলামি'* , অরুন ঘোষের *'অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান'* নিহার রঞ্জন রায়ের *'অস্বাভাবিক*

মনোবিজ্ঞান' , ধীরেন্দ্রাথ গাঙ্গুলীর *'মনের বিকার'* ইত্যাদি গ্রন্থ গুলি পাগল ও পাগলামি সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী বহন করে। সাম্প্রতিক বিশ্ব পেক্ষাপটে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাগলামি ও পাগল চিকিৎসার ইতিহাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে। তেমনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়া তথা ভারতীয় উপমহাদেশেও পাগলামির ইতিহাস ভারতীয় ও অভারতীয় ঐতিহাসিকরাও করেছেন, নতুন নতুন চিন্তা ভাবনার পেক্ষিতে পাগল চিকিৎসার ইতিহাসকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোকপাত করেছেন। বিদেশের বিভিন্ন গবেষণা কর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আন্ড্রু স্কাল'এর *'ম্যাডনেস ইন সিভিলাইজেশনঃ অ্যা কালচারাল হিস্ট্রি অফ ইন্সানিটি'* , *'ম্যাডনেসঃ অ্যা ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন'*, নাইজেল গিবসন সম্পাদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ডি কলোনাইজিংঃ দ্য সাইক্রিয়াট্রি রাইটিং অফ ফ্রানস ফ্যানন, মিশেল ফুকো'র বিখ্যাত গবেষণা কর্ম ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি ভাষায় লেখা *" ফলি এ দেরজঃ ইসতোয়ার দ্যা লা ফলি আ লাজ "* নামক গ্রন্থটি পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালের দিকে " *Madness and civilization : A History of Insanity in the age of Reason"* নামে ইংরেজি অনুবাদ আকারে প্রকাশিত হয়। আবার ড্যারিয়ান লিডার এর হোয়াট ইস ম্যাডনেস? রয় পোটার এর *'ম্যাডনেসঃ অ্যা ব্রিফ হিস্ট্রি'*, পেট্টিরি পিয়েটিকাইনেন এর *'ম্যাডনেসঃ অ্যা হিস্ট্রি'* , এবং টমাস স্টিফেন শাজজ এর *'ইনসানিটিঃ দ্য আইডিয়া অ্যান্ড ইডিয়ট কন্সিকয়েন্স'* ইত্যাদি গ্রন্থ গুলি থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছি। উক্ত গ্রন্থ গুলি বর্তমান পাগলামি চর্চার ইতিহাস কে একটি নুতুন মাত্রা দিয়েছে। আবার এটাও সত্য ফ্রানস ফ্যানন ও অ্যান্ড্রু স্কাল গবেষণা কর্মের ফলে ফুকোর কাজের যে প্রভাব অনেকটা কমে গেছে এবং পাগলামি ইতিহাসচর্চার ওপর একটি নতুন প্রভাব পড়েছে, তা হল ফ্যানন ও স্কাল এর চিন্তা ভাবনার পর পাগলদের ইতিহাসে একধরনের ছেদ বা ব্রেক সৃষ্টি করেছে পরবর্তী গবেষকদের কাছে। যে ধরনের প্রশ্নগুলি ঘিরে মনোচিকিৎসার ইতিহাসগুলি নির্মিত হয়েছে তা কোন এক 'সত্য' কে বাস্তবসম্মত এবং প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করার জন্য পাগলামি ইতিহাসচর্চার সাবেকি পদ্ধতিকেই প্রশ্ন করেছে ।

গবেষণার ক্ষেত্র পরিসর ও সুযোগ

ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় গড়ে ওঠা বাংলার পাগল ও পাগলাগারদের ইতিহাস নিয়ে খুব বেশি গবেষণা ইতিপূর্বে হয়নি । যদিও এ প্রসঙ্গে দেবযানী দাস এর " হাউজেস অফ ম্যাডনেস" (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০১৫) নামক গবেষণা গ্রন্থটি খুবই উল্লেখযোগ্য, উক্ত গ্রন্থে তিনি উনিশ শতকের উপর উন্মাদ আশ্রমগুলি স্বল্পপরিসরে উপস্থাপন করেছেন। এছারাও বাংলার উন্মাদ আশ্রম নিয়ে কিছু লেখা ভারতীয় ও অ-ভারতীয় গবেষকরা প্রকাশ করেছেন। যদিও ঐ প্রবন্ধ গুলিতে পাশ্চাত্য মনশ্চিকিৎসার নতুন বিশ্লেষণে ভারতীয় মন কীভাবে ক্যাটেগরিভুক্ত হল সে নিয়ে আলোচনা প্রায় নেই । ছন্দক সেনগুপ্ত অবশ্য মনশ্চিকিৎসার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা করেছেন কলকাতার প্রেক্ষাপটে, কিংবা ওয়াল্ট্রড আরনস্ট'এর নেটিভ উন্মাদ আশ্রমের প্রবন্ধ মূলক গবেষণা খুবই উল্লেখযোগ্য । কিন্তু উনিশ শতকে বাংলায় উন্মাদ আশ্রমের প্রতিষ্ঠার যে যাত্রাপথ হয়েছিল তার পরিপূর্ণতা বিকশিত হয়েছিল বিংশ শতকের প্রথম অর্ধ-কালীন সময়ে অর্থাৎ উন্মাদ আশ্রম থেকে মানসিক হাসপাতালে যে উত্তরণ তা ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র । কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে আজ অবধি কোন পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা হয়নি। আবার অনুস্কা ভট্টাচার্যের 'ইন্ডিয়ান ইনসেন' (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়,২০১৩) গবেষণায় ভারতীয় পাগলদের নিয়ে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক আলোচনা করেছেন তবে সেক্ষেত্রে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি আলোচনা খুব সামান্য ভাবে তুলে ধরেছেন, আবার সারাহ পিনটো'র ' মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উন্মাদ আশ্রম ' (ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়,২০১৭) নিয়ে গবেষণা করেছেন, ভারতের উন্মাদনা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজগুলি উল্লেখযোগ্য ,কিন্তু উক্ত গবেষণা গুলিতে উন্মাদনার ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা হলেও লুনাসি অ্যাক্ট তথা পাগল আইন নিয়ে কোন ভাবেই সম্পূর্ণ আলোচনা হয়নি , অর্থাৎ উন্মাদ আইনের ইতিহাস ও ঔপনিবেশিক বাংলার জনসমাজে তার প্রভাব নিয়ে এখনো অবধি কোন গবেষণা হয়নি। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় ১৮৫৮ থেকে ১৯১২ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ে এদেশীয় সমাজে পাগলদের জন্য যে বিভিন্ন আইন তৈরি হয়েছিল সে বিষয়ে একটি বৃহৎ ক্ষেত্র বা গবেষণার জায়গা আছে, কিন্তু আজ অবধি উক্ত বিষয়ে কোনোরূপ পরিপূর্ণ গবেষণা হয়নি। তাই বাংলার পাগল ও পাগলা গারদের ইতিহাসে উন্মাদ আইনের বিষয়েটি আলোচনা খুব-ই প্রাসঙ্গিক। বাংলার সমাজ জীবনের চিকিৎসা ব্যবস্থার বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে কয়েকটি কাজ খুবই উল্লেখযোগ্য , যে গুলি হল সুব্রত পাহারীর ' উনিশ শতকের বাংলার সনাতনী চিকিৎসা

ব্যবস্থার সরূপ ’ (২০০৩), বিনয় ভূষণ রায়- এর ‘ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস’ (২০০৫), সাম্প্রিতিক সুজাতা মুখার্জি ‘ জেন্ডার মেডিসিন এন্ড সোসাইটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া’ (২০১৭) উক্ত গবেষণা মূলক গ্রন্থে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় চিকিৎসা ও ঔপনিবেশিক চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে । কিন্তু পাগল চিকিৎসার ইতিহাস সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা নেই বললেই চলে। যদিও দেবযানী দাস এর হাউজেস অফ ম্যাডনেস তার গবেষণা কর্মে উনিশ শতকে আশ্রমিক পাগল চিকিৎসা সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে বিশ্লেষণ করেছেন। আবার বিদেশী ঐতিহাসিক দের মধ্যে ওয়ালট্রড আরনস্ট , সারাহ পিণ্টো কিংবা দেবোরা ফুলে এর প্রমুখ তাদের ভারতীয় উন্মাদ আশ্রম বিষয়ক গবেষণায় আশ্রমের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন। এতদ সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক বাংলার পাগল চিকিৎসার ইতিহাসে কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে । কিন্তু বাংলায় পাগলের চিকিৎসার যে সার্বিক চিত্রে দেশীয় ধারা তথা আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে উন্মাদ চিকিৎসার বিষয় টি অপূর্ণ থেকে গেছে। সেটি হল বাংলায় পাগলের চিকিৎসার যে সার্বিক চিত্রে দেশীয় ধারা তথা আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে উন্মাদ চিকিৎসার ইতিহাস , উক্ত বিষয়গুলি নির্বাচিত গবেষণা আলোকপাত করেছি ।

সময়কাল

আলোচ্য গবেষণা কার্যের সময়-কাল হিসাবে ঔপনিবেশিক অধ্যায় কে নির্বাচিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উনিশ শতক থেকে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত নির্ধারিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৮০০ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কাল পর্বের মধ্যে ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ পাগলদের কিভাবে দেখা হতো তা অনুসন্ধান করা ।

অধ্যায় বিভাজন

ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগল,পাগলাগারদ ও সমাজ (১৮০০-১৯৪৭ খ্রীঃ) নামক শীর্ষক শিরোনামাঙ্কিত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রধানত ৫ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা-

প্রথম অধ্যায়- ঔপনিবেশিক বাংলার পাগল: একটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ।

দ্বিতীয় অধ্যায়- ঔপনিবেশিক বাংলার উন্মাদ আশ্রম (১৮০০-১৯০০ খ্রীঃ)

তৃতীয় অধ্যায়- ঔপনিবেশিক বাংলার মানসিক হাসপাতাল (১৯০০-১৯৪৭খ্রীঃ)

চতুর্থ অধ্যায়- উন্মাদ আইনের ইতিহাস ও সরূপ: ঔপনিবেশিক বাংলায় তার প্রভাব (১৮৫৮-১৯১২ খ্রীঃ)

পঞ্চম অধ্যায়- উন্মাদ রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি ।

গবেষণামূলক প্রশ্ন

আলোচ্য গবেষণায় প্রাথমিক ভাবে যে অনুসন্ধান মুলক প্রশ্ন প্রাধান্য আরোপ করার চেষ্টা করেছি সেগুলি হল, যথা-

প্রথমতঃ ঔপনিবেশিক সমাজে পাগলদের কে কিভাবে দেখা হতো? বিশেষ করে রাষ্ট্র পাগলদের কেমন ভাবে দেখত ? অর্থাৎ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কে পাগল? কারা পাগল ? কেন পাগল ? পাগল সম্পর্কে সমাজ সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ? বাংলার ইতিহাসে পাগলরা যুগ যুগ ধরে কিভাবে আলোচিত ? এবং উনিশ শতকে বিশেষ করে নবজাগরণ পর্বে পাগল দের কিভাবে দেখা হত?

দ্বিতীয়তঃ ঔপনিবেশিক বাংলায় উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ? উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে ঔপনিবেশিক বাংলায় সর্বাধিক উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠা কেন হয়েছিল? ভিক্টরীয় নীতি, অনুশাসন ও অপর দিকে হিতবাদী দর্শনের যে প্রচার ঔপনিবেশিক শাসককুল করত তাঁর ফলপ্রসু কতটা হয়েছিল ? না কি এই নীতি অনুশাসনের পশ্চাতে অন্য কোন দুরাভিসন্ধি কাজ করেছিল ?

তৃতীয়তঃ উন্মাদ আশ্রম বা মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশীয় ঐতিহ্য কতটা ভূমিকা পালন করেছিল ? আবার উনিশ শতকে পাগলাগারদ থেকে মানসিক হাসপাতালে উত্তরণ কিভাবে ও কেন হয়েছিল ? তা আনুসন্ধান করা।

চতুর্থতঃ ঔপনিবেশিক সরকার বাংলায় পাগলদের নিয়ন্ত্রন করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছিল ? উন্মাদ আইন তৈরি করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল ? সেক্ষত্রে পাগল দের জন্য যে আইন তৈরি করা হয়েছিল সেই আইনের স্বরূপ কি ছিল? এবং পাগলের আইনগত অধিকারের

তাৎপর্য কি ছিল ? সর্বোপরি ঔপনিবেশিক বাংলায় লুনাসি অ্যাক্ট বাংলার সামাজিক জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল ?

পঞ্চমতঃ ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগলদের চিকিৎসার জন্য কি কি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল? সেক্ষেত্রে উন্মাদ রোগ চিকিৎসায় পশ্চিমী চিকিৎসা , ইউনানী চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কতটা ফলপ্রসু ছিল ? এছারাও পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রে কুসংস্কার আচ্ছন্ন যুগ থেকে কিভাবে মনচিকিৎসার যুগে বিবর্তিত হল তা অনুসন্ধান করা। সর্বোপরি উন্মাদ চিকিৎসায় পশ্চিমীচিকিৎসা থেকে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি যে অধিক উন্নত ছিল তা যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে প্রমান করার চেষ্টা ।

উদ্দেশ্য ও বস্তুনিষ্ঠতা

বস্তুনিষ্ঠ দর্শনের নিরীখে পাগল দের সামাজিক অবস্থা বিশে-ষণ করার প্রচেষ্টা , তবে এক্ষেত্রে পশ্চিমী চিন্তাভাবনা বর্জন করে প্রাচ্য-বাদী ভাবনায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে পাগলদের বাস্তবমুখী ইতিহাস উপস্থাপন করা। বিশেষ করে বাংলার সমাজে পাগল ও পাগলামির বহুত্ব ধারনা কে কেন্দ্র করে সামাজিক ও ক্লিনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস । পশ্চিমী জ্ঞানচর্চার থেকে আলাদা ভাবে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে পাগলদের ইতিহাস কিভাবে আলোকপাত করা যায় তার একান্ত প্রচেষ্টা করা। বিশেষ করে বাংলার সামাজিক জীবনে পাগলদের বহুত্ব ধারনার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা, পাশাপাশি উন্মাদ রোগের চিকিৎসায় পশ্চিমের চিকিৎসা পদ্ধতি অপেক্ষা ভারতীয় চিকিৎসা যে অধিক উন্নত ছিল তার যুক্তিনিষ্ঠ প্রমাণ করার চেষ্টা ।

গবেষণা পরিকল্পনা ও পদ্ধতি

ঔপনিবেশিক বাংলার পাগল ও পাগলাগারদের ইতিহাস শিরনামাঙ্কিত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকসম্মত ইতিহাস পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, ক্ষেত্র সমীক্ষা, মনবিদের সহিত সাক্ষাৎকার, কালানুক্রমিক পদ্ধতিতে সরনী ও দুর্লভ চিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণার আকার ও অবয়ব রচনা করার চেষ্টা করেছি । গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রস্তুতি ও গবেষণায় তথ্য বিন্যাসে প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে , এছাড়াও গবেষণার আঞ্চলিক

পরিভাষা ও শব্দকোষ ,তথ্যসুত্রের প্রকার ভেদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গৌণ উপাদান ইত্যাদি বিষয় সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি ।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর সবদেশের ইতিহাসের মধ্যেই পাগল চিকিৎসার উল্লেখযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় । তখনকার দিনে এই ধরনের আচরণের সুচিকিৎসা দূরের কথা, সেগুলির যথার্থ ব্যাখ্যাও মানুষের জানা ছিল না। ফলে পাগলদের অস্বাভাবিক আচরণ কে ঘিরে মানুষের মনে তৈরি হয়েছিল কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা, অন্ধবিশ্বাস ও বিকৃত ব্যাখা। বহু ক্ষেত্রেই এগুলিকে শয়তান বা অপদেবতার প্রভাব থেকে উদ্ভুত ঘটনা বলে মনে করা হত, কখনো কখনো অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ , শান্তি- স্বস্তায়ন , দেবতার সন্তুষ্টির আয়োজন এবং অমানুষিক চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা এগুলি দূর করার চেষ্টা করা হত। তেমনি বঙ্গদেশেও পাগল ধারনার ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

গবেষণার **প্রথম অধ্যায়ে** আলোকপাত করা হয়েছে মুলত ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে পাগলের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ ঔপনিবেশিক বাংলায় সমাজিক জীবনের পাগলকে কত রকম ভাবে দেখা হতো এবং সমাজের সাথে পাগলের আসল মেলবন্ধন টি কোথায় যেখানে শুধু তত্ত্বের খাতিরে পাগলকে বিশ্লেষণ করা নয় বাস্তব পরিস্থিতি ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে পাগলকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে , পাগলের পাগলামির পিছনে যে সামাজিক সংঘাত তা সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করা । পাশাপাশি যুক্তির সাথে পাগল ও পাগলামির আসল সম্পর্কটা কি অর্থাৎ কে পাগল ? কারা পাগল ? কেন পাগল ? এটা নির্দিষ্ট করে কারা। স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় যে, এক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্কের মাধ্যমে যৌক্তিকতা ও সমাজ জীবনের বন্ধন এর বিষয়টিও স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যাটি আলোচিত হয়েছে । পাগলদের বৈচিত্র্য কি । কত রকমের পাগল সমাজে হতে পারে । এক পাগলের সঙ্গে তাপর পাগলের বৈসাদৃশ্য কি এবং পাগলের চাহিদা কি ? পাগল কি চায় ? পাগলদের ইচ্ছার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কিভাবে তৈরী হয়েছে । আবার ভাব জগতে পাগল বা আধ্যাত্ম জগতের পাগল সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হয়েছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল **" ঔপনিবেশিক অধ্যায়ে বাংলার উন্মাদ আশ্রম "**। ১৮০০ থেকে ১৯০০ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়কাল পর্বে ঔপেনিবেশিক শাসনের উন্মাদ আশ্রম কেন গড়ে উঠেছিল তা আলোচনা করেছি । এই অংশে উন্মাদ আশ্রমের প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ইতিহাস ও উন্মাদ আশ্রম কিভাবে বিকশিত হয়েছিল তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি । যথা, ডিকের পাগলা গারদ (১৮০৮) , ঢাকা লুনাটিক অ্যাসাইলাম (১৮১৫) , বিয়ার্ডস্মরের উন্মাদ আশ্রম (১৮১৭) , রসা পাগলা আশ্রম (১৮২১) , নেটিভ ইনসেন্স অ্যাসাইলাম , দুলান্দা (১৮৩৪) , ভবানীপুর মেন্টাল অ্যাসাইলাম (১৮৯৫) , পাটনা লুনাটিক অ্যাসাইলাম , কটক লুনাটিক অ্যাসাইলাম , ময়দাপুর লুনাটিক অ্যাসাইলাম , তেজপুর লুনাটিক অ্যাসাইলাম (১৮৭৬) , বহরমপুর লুনাটিক অ্যাসাইলাম , (১৮৭৬) ইত্যাদী বিষয়গুলির প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল **" উন্মাদ আশ্রম থেকে মানসিক হাসপাতালে উত্তরণ"** ১৯০০ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়কালে বাংলার বিভিন্ন মানসিক হাসপাতালগুলির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি । এই পর্বে বঙ্গদেশে উন্মাদ আশ্রমের বদলে যে মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে । যেমন- বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম (১৯১৬) , গোবরা লেপার অ্যাসাইলামে মানসিক ওয়ার্ড (১৯১৬) , কেন্দ্রীয় মানসিক হাসপাতাল , রাঁচি (১৯২৫) , পরবর্তীকালে দত্তনগর মেন্টাল হাসপাতাল), মানকুন্ডু মেন্টাল হাসপাতাল (১৯৩৩) , কোলকাতা মেডিকেল কলেজ- মনচিকিৎসা বিভাগ (১৯৩৯) , লুম্বনী পার্ক মেন্টাল হাসপাতাল (১৯৪০), ইত্যাদী হাসপাতালগুলির ঐতিহাসিক বিবরণ আলোকিত হয়েছে। সর্বপরী ঔপৌনিবেশিক শাসনতন্ত্রে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে লুনাটিক অ্যাসাইলাম ও মেন্টাল হাসপাতালের যে সম্পর্ক তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি ।

চতুর্থ অধ্যায়ের মূল বিষয়ে হল "উন্মাদ আইনের ইতিহাস ও সরূপ : ঔপনিবেশিক বাংলায় তার প্রভাব "। এই অধ্যায়ের মুখ্য আলোচনার বিষয় হল ঔপনিবেশিক সমাজে উন্মাদ আইনের মাধ্যমে পাগলের উপর যে নিয়ন্ত্রন শুরু হয়েছিল সেগুলি উপস্থাপন করা চেষ্টা করেছি। এছারাও

উন্মাদ আইনের স্বরূপ কি ছিল ও পাগলের আইনগত অধিকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা , সর্বোপরি ঔপনিবেশিক বাংলায় লুনাসি অ্যাক্ট বাংলার সামাজিক জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তা ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুসন্ধান করা। আবার কালানুক্রমিক অবস্থার ভিত্তিতে এদেশীয় সমাজে পাগলদের জন্য যে আইন গুলি প্রনয়ন করা হয়েছিল সে গুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, এই আইন গুলি হল যথা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট ১৮৫৮ , মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট (নবম আইন ১৮৭৭,) ক্রিমিন্যাল লুনাটিক অ্যাক্ট , অধ্যায় (চৌত্রিশ নং) ১৮৯৮, প্রিজনার লুনাটিক অ্যাক্ট (অ্যাক্ট ১৯০০), দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট ১৯১২ । ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় অন্যান্য বেশ কিছু আইনেও পাগল সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। সেই আইন গুলি হল যথা- ১৮৬০ সালের দন্ডবিধি আইন , ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ সালের চুক্তি আইন, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি, দি বেঙ্গল জেলকোড, ১৯০০ সালের কয়েদী সম্পর্কিত আইন ইত্যাদি বিষয় গুলিও এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ের মুল আলোচ্য বিষয় হল উন্মাদ রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি । ঔপনিবেশিক বাংলায় কত রকম ভাবে উন্মাদ রোগীদের চিকিৎসা করা হত সেগুলি আলোকপাত করেছি , বিশেষত বাংলার সামাজিক জীবনে পাগল বা উন্মাদ ধারণার সঙ্গে ভূতে পাওয়া বা অপদেবতার যে সম্পর্ক সেই ধারনা কেমনভাবে ধীরে ধীরে কিভাবে বিলুপ্ত হয়ে মনোচিকিৎসার জগতের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছিল তা আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচনা করেছি । রেনেসাঁ যুগে কুসংস্কার বর্জিত হয়ে কিভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগে উত্তরণ হল তা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এবং বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে পাগল কে কিভাবে উন্মাদদের কিভাবে দেখা হত সেগুলি স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করেছি। প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে দেশীয় সমাজে পাগল চিকিৎসা কীরূপ ছিল সেগুলি স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করার পর বঙ্গদেশে উন্মাদআশ্রম গুলিতে পাগল চিকিৎসার সরূপ কি ছিল তা মূল আলোচনার পাশাপাশি বিশ্লেষণ করেছি । আবার আধুনিক যুগ বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক যুগ ও ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগলের নৈতিক চিকিৎসা, মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা, উনিশ শতকে উন্মাদপীড়ার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, উন্মাদের চিকিৎসা পদ্ধতির কয়েকটি উদাহরণ হিসাবে উন্মাদ রোগ চিকিৎসার কেস-স্টাডি,

পাগল চিকিৎসায় সম্মোহন পদ্ধতি , পাগলামি নিরাময়ের জল চিকিৎসা (হাইড্রোথেরাপি) ইত্যাদি বিষয়গুলির ইতিহাস আলোচনা করার চেষ্টা করেছি । অতঃপর বিংশ শতকে পাগল চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি আলোচনা করেছি সেগুলি হল মানসিক রোগের পরিবেশগত চিকিৎসা , মনো-অভিনয় চিকিৎসা, রাসায়নিক চিকিৎসা, বৈদ্যুতিক শক থেরাপি, ইনসুলিন শক থেরাপি, মনোবৈজ্ঞানিক শল্যচিকিতসা, মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে মন:সমীক্ষণ বা মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতি , মক্কেলকেন্দ্রিক মনোচিকিৎসা, খেলাভিত্তিক চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়গুলি কালানুক্রমিক অবস্থার ভিত্তিতে এদেশীয় সমাজে পাগলদের চিকিৎসার যে বিবর্তন লক্ষ্য করে গিয়েছিল সেগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচ্য অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছি । পরিশেষে মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঁচটি অধ্যায়ের গবেষণালব্ধ মূল সিদ্ধান্তগুলি আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি ।

মূল্যায়ন

উপরিউক্ত পাঁচটি অধ্যায়ের আলোচনার শেষপর্বে সার্বিক মূল্যায়নে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, উনিশ শতকের সূচনা থেকে বিংশ শতকের প্রাথমিক পর্বে নবজাগরণের ফলে পাগলদের নিয়ে বৌদ্ধিক ভাবনা চিন্তায় একটি প্যারাডাইম- শিফট তৈরি হয়েছিল , কারণ এই সময় যুক্তিবাদ ও নবজাগরণ মানুষকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সামাজিক ভাবনায় যুক্তির আলোকে বিভিন্ন চিন্তা ও চিকিৎসার আলোকে পাগলদের নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা শুরু হয়। পাশাপাশি পাগলামি সম্পর্কে নতুন ডিসকোর্স তৈরী হয়েছিল এবং পাগলদের নিয়ে এপিসটোমোলজিকাল ও তাত্ত্বিক ভাবনা শুরু হয় ।

মনোচিকিৎসা ও মানসিক হাসপাতালে উত্তরনের পর পুরাতন সমস্ত পদ্ধতি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল । আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্মদনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ফলে পূর্ববর্তী পাগল নামক ভৌতিক ধারণা জনমানস থকে ক্রমশঃ অবসান ঘটেছিল। বিভিন্ন রকমের গবেষণা ও পাগলদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ফলে পাগল চিকিৎসার ইতিহাসে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন হয়েছিল । অবশেষে মনোবিজ্ঞানচর্চার ফলে পাগল সম্পর্কিত ভাবনার রূপান্তরিত হয়েছিল মানসিক রোগীতে, আর পাগলাগারদ পরিবর্তিত হয়েছিল মানসিক হাসপাতালে। উনিশ শতকের এনলাইটেড পর্বে বা রেনেসা উত্তোরনের সময় পাগলামি নামক

অবজেকটিভ ধারণা থেকে আধুনিকতার উত্তোরনের সঙ্গে সঙ্গে পাগল ও পাগলামি সাবজেকটিভ বিষয় আকারে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়ে ওঠে ।

অপর দিকে ঔপনিবেশিক কাঠামোয় বাংলায় পাগলাগারদের চিকিৎসার প্রয়োজন ও পাগলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নানারকম নিয়ম- কানুন তৈরি হয় এবং চিকিৎসার ব্যাপারটা বেশ আরবিট্রারি বা আন্দাজি ছিল। ঔপনিবেশিক শাসকরা গোটা উনবিংশ শতক জুড়ে আলোকপ্রাপ্তি আর প্রগতির দোহাই দিয়ে নেটিভ পাগল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানসিক রোগ সম্পর্কে তারা উপর সমীক্ষা , অভীক্ষা ও জ্ঞান অন্বেষণের প্রক্রিয়া চালিয়েছিল। অন্য দিকে ঔপনিবেশিক উন্মাদ আইনিগুলি নৈতিক চিকিৎসার নামে পাগলের সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু পাগলকে মুক্তি দেওয়ার নামে এই আইনী বৈধ ব্যবস্থা পাগলের জন্য আরও বেশি শক্তিশালী 'নৈতিক কারাবাস' এর জন্ম দিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক বাংলায় উন্মাদ রোগ চিকিৎসা ক্ষেত্রে মধ্যেও বহুমাত্রিক অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যেটি পরিপুষ্ট হয়েছিল দেশীয় ঐতিহ্য ও পশ্চিমী চিকিৎসার মধ্য দিয়ে । পরবর্তীকালে এই বহুমাত্রিক চিকিৎসা স্বাধীনত্তোর ভারতে একটি পরিপূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্যনীতি রচনায় সাহায্য করে, যা মনোচিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নবদিগন্ত রচনা করেছিল এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজও উপলব্ধ।